অলীক স্বপ্ন

কল্যাণ নন্দী

'কী নাম?'

'অজিত বটে।'

'অজিত কী?'

'চুপ, কোনো উত্তর নেই।

'তোমার পদবি নেই, পদবি?'

এবারেও চুপ।

আমার পাশে বসা স্থানীয় মানুষ অনন্ত চুপিচুপি বলল, 'বলবে না স্যর।'

আমারও চুপিচুপি জিজ্ঞাসা, 'কেন বলবে না?'

'পরে বলব স্যর।'

'থাকো কোথায়?'

'নিকটে।'

'গ্রামের নাম কী?'

কথা নেই। মাথা নিচু করে বসে আছে।

অনন্ত আবারও সেই চুপিচুপি বলল, 'বলবে না স্যর।'

এতো মহাজ্বালা। কিছুই বুঝতে পারছি না। ওকে কাজে বহাল করতে গেলে আইন মোতাবেক পুরো নাম ঠিকানা চাই। অস্থায়ী হলেও একটা নিয়োগপত্র দিতে হবে।

চুপিচুপি নয়, অনন্তকে জোরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন? নাম-ঠিকানা না হলে কী করে হবে?'

অনন্ত ফিসফিস করে বলল, 'স্যর, ওরা লোধা। এটা জানাতে চায় না। সকলের ধারণা, ওরা চুরি ডাকাতি করে খায়। বদনাম একবার লেগে গেলে মুছতে চায় না। পরিচয় দিলে যদি চাকরিটা না পায়, তাই বলছে না।'

'ওর নামের পদবি ও ঠিকানা একটা জোগাড় করা যাবে?'

'হ্যাঁ স্যর, তা হয়ে যাবে। আমি জানি স্যর।'

একটু ভেবে বললাম, 'তুমি কাজ করবে তো? আমার সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরতে হবে। ছেড়ে চলে যাবে নাতো?'

মুহূর্তে অজিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'না বাবু থাইকব। লিয়ে দ্যাখেন কেনে?'

'তুমি এদিকটায় সব চেনো?'

'হঁ বাবু, চিনি বটে। কুথাকে যাবেন, বইল্যে লিয়ে যাব।'

'বেশ তোমার কাজ পাকা। কাল বাদে পরশু থেকে শুরু।'

জানি অনন্ত একটু অবাক হল। তা হোক। ওকেই আমার চাই।

এখানে একটা বড়ো কারখানা হবে। ভারী শিল্প যাকে বলে। আমাদের কোম্পানিকে একটা সার্ভের বরাত দিয়েছেন সেই শিল্পপতি। কনসালটেন্সি ফার্ম হিসেবে আমাদের কোম্পানির ভারতজোড়া খ্যাতি। আমাকে এই সার্ভের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে। স্থানীয় মানুষ রিক্রুট করে ফিল্ড সার্ভে করতে হবে। অনন্ত প্রথম রিক্রুট। উচ্চমাধ্যমিক পাস। নিজেদের জমিজমা হয়তো আছে। চাষবাস করে না। অজিত দ্বিতীয় রিক্রুট। কী কী করতে হবে তার একটা প্রশ্নমালা তৈরি হয়েছে। সেই ধরে ধরে কাজ। যেমন, কারখানার জন্যে সাইট নির্বাচন ঠিক কিনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন, কারখানা হলে স্থানীয় সমস্যা কী কী হতে পারে, কীভাবে সমস্যা কাটানো যাবে, বাজার দরে জমি কেনা যাবে কিনা, কারখানা চালু হলে চাকরির জন্য আন্দোলন শুরু হবে কিনা— এরকম প্রশ্নমালা খুঁটিয়ে দেখে মাটির কাছে নিয়ে গিয়ে উত্তর খুঁজতে হবে। সেই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করবে কারখানার ভবিষ্যৎ। শিল্পপতি ইনভেস্ট করার পূর্বে তলিয়ে দেখে নিতে চাইছেন। টাকা খরচ করে মাটি ঘেঁষা টাটকা রিপোর্ট চাইছেন। শুধু শহরের লোক দিয়ে এই কাজ হবে না। তাই সঙ্গে স্থানীয় অনন্ত ও অজিত। প্রয়োজনে পরে লোক বাড়তে পারে।

রাঢ়ভূমির যে অঞ্চলে কারখানা গড়ার প্রস্তাব উঠেছে তা জেলা সদর থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে। হাইওয়ের ধারে লালমাটির জমি। রুখাশুখা হলেও চাষবাস হয়। ধান, মরশুমি সবজি ফলে। বৃষ্টি জল ছাড়াও ভরসা কংসাবতীর ক্যানালের জল। এ জেলায় ঊষর জমির অভাব নেই। অগাধ শ্রমের বিনিময়ে ফসল ফলে। মোরাম, ল্যাটেরাইট মিশ্রিত মাটিতে চাষ যথেষ্ট শ্রমনির্ভর। প্রয়োজন জলের পর্যাপ্ত জোগান। ওই সব জমিতে ঘামের দর ওঠে না। শিল্পের জন্য উপযুক্ত। দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু এইসব জমিতে তীর্যকভাবে পড়লে ফসলের জমি প্রাণ খুঁজে পায়। মনের আনন্দে বিয়োতে পারে ধান-সবজি বছরভর।

জমির মালিকানা বহুভাগে বিভক্ত। মালিকের সিংহভাগ মানুষ চাষে যুক্ত নয়। গাঁয়ে থাকেন না। সদরে বা কলকাতায় বা ভিন রাজ্যে ঘর-বাড়ি। সে জমিতে চাষ হয় ভাগে। কিছু সংখ্যক জমির মালিক নিজেই চাষ করেন। চাষের সঙ্গে যুক্ত বহু খেতমজুর। ধান রোয়া বা ফসল তোলার সময় যুক্ত হয় দূর থেকে আসা কৃষিশ্রমিক। মোটকথা, একটা চাষের জমি দেয় বহু মানুষের সাদা ভাতের সন্ধান। জমির চরিত্র পরিবর্তন হলে সকলেই রুজি হারাবে। দু-মুঠো অন্ন জোগানোর বিকল্প ব্যবস্থা বলতে অন্য জমিতে চাষের কাজ খুঁজে নেওয়া। কারণ চাষ ভিন্ন অন্য পেশায় যুক্ত হওয়া সহজ নয়। ওদিকে চাষ বিযুক্ত মালিকের জমির মালিকানা বজায় রাখার হ্যাপা সামলানো থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজতম

উপায় বিক্রি। লাভ তাদের যারা চাষের সঙ্গে যুক্ত নয়। ক্ষতি তাদের, যারা সরাসরি চাষে যুক্ত। কারখানা হলে এদের কারোর কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। সেই কাজ মূলত কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের। স্থানীয় মানুষের কাজ বলতে মজদুর দারোয়ান, সাফাই কর্মী ইত্যাদি পেশার কাজ বড়োজোর জুটতে পারে। কিছু দোকান-পাট হতে পারে। মদের দোকান না থাকলে সেটাও হবে। এ সবই অনুমান। চিত্রটা পরিষ্কার হবে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও কথোপকথনে।

জমির ম্যাপ ও মালিকানার তালিকা হাতে এসেছে আশিসের। যেহেতু এখানে থেকে অনুসন্ধান চালাতে হবে তাই দরকার একটি অস্থায়ী আস্তানা। কাছাকাছি দু-কামরার ঘর জুটে গেল। অজিতই খোঁজ এনেছে। অজিতের ঘর এখান থেকে নিকটে নয়, দূরে। ফলে ও আশিসের সঙ্গে থাকবে। অজিতের গাঁ থেকে এই জমিতে খেতমজুরের কাজ করতে আসে। অজিত নিজেও ওই কাজ করেছে এক সময়ে।

কোম্পানির দেওয়া প্রশ্নমালার বাইরেও অসংখ্য প্রশ্নাবলী ইতোমধ্যে আশিসের মাথায় ঢুকে পড়েছে। অজিতের সঙ্গে কথা বলে এইসব প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মাঠে নেমে কাজ করার আগে একবার আশিস কলকাতার অফিসে কথা বলে নিতে চায় অন্তত মৌখিক অনুমোদনের জন্য। তারপর মাঠে নেমে কাজ শুরু হলে আরও কত কী উঠে আসতে পারে, তাও আগাম জানিয়ে রাখবে। কোনো ফাঁক রেখে কাজ করা আশিসের ধাতে নেই। রিপোর্টের ভাগ ও বিন্যাস নিয়ে আশিস ভাবতে শুরু করে।

দুই

কলকাতায় ফিরে আশিস কন্যাকুমারীকে তার নতুন কাজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। কন্যাকুমারী ওর ভালো বন্ধু। দীর্ঘ পাঁচ বছরের সম্পর্ক। আশিস নিজে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট করে এখন এই কর্পোরেটে। কন্যাকুমারীর বিষয় সমাজ বিজ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে এখন মুক্ত একটা প্রোজেক্টে। বন্ধুত্বের সীমানা টপকে যাপনের প্রশ্নে ওরা কবে জড়াবে তা কেবল নিজেরাই জানে।

আশিসের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে কন্যাকুমারী খানিক ভেবে বলল, 'ওই গানটা মনে আছে তো— জীবন যখন শুকায়ে যায় ...'

'হ্যাঁ আছে তো। তার পরেই তো আছে করুণাধারায় এসো।'

'ঠিকই বলেছ।'

'হঠাৎ এ প্রসঙ্গ?'

'বলছি পরে। তোমার নতুন রিক্রুট অজিতদের জীবন জন্ম থেকেই শুষ্ক। একে গরিব তায় নিরক্ষর। একজন মানুষ তার শৈশব থেকে 'সন্দেহভাজন'-এর তালিকায়। ওরা নাকি

জন্ম ইস্তক অপরাধপ্রবণ। রক্তে অপরাধ কণিকা মাত্রাধিক। চুরি-ডাকাতি ওদের পেশা। ইদানীং নাকি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বড়ো দুর্বিষহ জীবন ওদের। ধরো, রাতে ঘুমাতে গেল। আধপেটা খাওয়া ঘুম পাতলাই হয়। জাগিয়ে তুলল, হয় বনপার্টি বা পুলিশ। দু-তরফই তুলে নিয়ে যায় হিড় হিড় করে। একদল কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে দেয়, অন্যদল থানায়। তারপর জেল। জানতেই পারে না অপরাধ কোথায়? সেই হরিণ-নেকড়ের গল্প। তুই না করলেও তোর বাপ-ঠাকুরদা করেছে। নে এবার জেলে পচ। বিনা বিচারে বন্দি বছরের পর বছর। প্রমাণাভাবে যখন ছাড়া পায় তখন জীবন থেকে দু-একটা বছর খসে যায়। এর জবাব দেওয়ার দায় রাষ্ট্র নেয় না।'

'সেই জন্যই কিছুতেই পদবি ও গ্রামের নাম বলতে চায়নি। চূড়ান্ত অভাবের সংসারে চাকরিটা যাতে না হারায়। তা তোমার এতসবের অভিজ্ঞতা কোথায় হল?'

'কিন্তু ওয়ার্ক করতে গিয়ে যা সব অভিজ্ঞতা হয়েছে ইতোমধ্যে তা গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো। তুমি যদি পরিসংখ্যান দেখো তবে দেখতে পাবে বিনা বিচারে বন্দিদের সিংহভাগ আদিবাসী বা দলিত নয়তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের অধিকাংশের না আছে শিক্ষা, না আছে অর্থ, না আছে রাজনৈতিক খুঁটি। ফলে এদের নিয়ে যা খুশি করার স্বাধীনতা রাষ্ট্রের আছে।'

'তুমি তো দেখছি কাজের সূত্রে অনেক কিছু জান। তাহলে বলো, অজিতকে নিয়ে ঠিক করেছি?'

'অবশ্যই ঠিক করেছ। এবারে গানের কথায় আসি। তুমি হয়তো সেই করুণাধারা।'

'ওকে নিয়ে কিন্তু ব্যাপক ঘুরতে হবে মাটি ঘেঁষে। অনন্ত বলছিল, স্যর একটু সাবধানে থাকবেন।'

'আমি তোমায় বলছি, কোনো সাবধানতা নিতে হবে না। বিপদ এলে ওই তোমায় প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করবে। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা। সে গল্প পরে কোনোদিন হবে। ওদের মাটিতে আর যাইহোক নারীর সম্মান প্রতিপলে অক্ষুণ্ণ থাকে। যা আমাদের এখানের চরে খাওয়া ভূমি প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হয়ে চলেছে। নিশ্চিন্তে ঘোরো। বিশ্বাস করো, ভরসা রেখো প্রতিদান পাবে সুদে-মূলে।'

'যাক, তোমার সঙ্গে আলোচনা করে খুঁতখুঁতে মনটা হালকা লাগছে।'

'এই যে জন্ম থেকে ওদের নামে অপবাদ দেগে দেওয়া তা অত্যন্ত নির্মম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কাজের সুযোগ সমাজ দিয়েছে এদের? শুধু অপবাদ দিয়ে অচ্ছুত করেছে। মানছি, এক সময় এরা অপরাধ করত। কেন করত? যা কিছু করত তা শুধু মাত্র ক্ষুধার তাড়নায়। সে কথা বলতে গেলে ওই সময় বাংলার অনেক জমিদার ডাকাত ছিল। কই ওদের পরবর্তী প্রজন্মকে অপরাধপ্রবণ বলে চিহ্নিত করা হয়? এমনিতে সবসময় দুর ছাই। অথচ ওদের ঘরের নারীভোগ ফাউ হিসেবে দেখা হয়। এক্ষেত্রে বলপূর্বক রমণের

সময় অশুচি বলে মনে হয় না। এই কাজগুলি নাকি পৈশাচিক নয়, ঘৃণ্য নয়। স্বাভাবিক, এমনকী এর পুনরাবৃত্তি ও স্বাভাবিক।'

'সমাজ ব্যবস্থা এত ভেদাভেদ! আমাদের মতো শহরবাসীর জানবার অবকাশ কোথায়?'

'আমি জানছি কী করে? থাকি তো শহরে। আবার এরা যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্পর্ধা দেখায়, তখন কিন্তু ভয় পাই। দমন করার জন্য উঠে পড়ে লাগি। ভাবটা এমন, পায়ের নীচে থাকার কথা, প্রতিস্পর্ধা হয় কী করে? সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীর স্ট্যাম্প পড়ে পিঠে। যাক, পরে আরও আলোচনা হবে। তুমি হঠাৎ চলে এলে?'

'কোম্পানির কিছু প্রশ্নাবলি হেড অফিস তৈরি করে হাতে ধরিয়েছিল। কাজের শুরু ওই ধরে হবে। গত কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার আরও কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে। মাঠে নামলে আরও আসবে। এ বিষয়গুলি নিয়ে আগাম জানিয়ে রাখতে এখানে আসা। পরশু আবার চলে যাব।'

'থিয়োরির সঙ্গে বাস্তবের কয়েক যোজন তফাত। যে শ্রেণিভুক্ত মানুষের সঙ্গে তুমি কথোপকথন চালাবে, তাদের সম্পর্কে তুমি কিচ্ছু জান না। ভালো হবে যদি তুমি আগে অজিত ও অনন্তর সঙ্গে কথা বলে নাও। নইলে ঠোক্কর খেতে হতে পারে প্রতি পদে।'

'তুমি বলছ বাধা আসতে পারে।'

'না, তা বলিনি। বাধা কেন আসবে? বলছি বিশ্বাস, ভরসা, সহযোগিতার চিহ্ন না থাকলে সম্পর্ক তৈরি হবে না। শহর থেকে গিয়েই কথাবার্তা শুরু করলে তোমার সঙ্গে মন খুলে আদৌ কথা বলবে? বলবে না। ওই যে বললাম বিশ্বাস অর্জন করতে হবে যে তুমি ক্ষতিকারক কোনো প্রস্তাব মেনে নিতে বলছ না। সম্পর্ক যদি ভাবনার সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে তা ভাঙা মুশকিল। আর যদি তা স্বার্থের সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে তা টেকানো মুশকিল!! আমার কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করে বললাম।

'চাষের জমি চলে গেলে ক্ষতি তো হবেই। যদি না রোজগারের বিকল্প ব্যবস্থা থাকে। টাকার অঙ্কে অনেকে রাজি হতে পারে ভবিষ্যতের কথা না ভেবে।'

'করপোরেট সংস্থায় চাকরি করবে আর মন পড়ে থাকবে গরিব নিরক্ষর মানুষের প্রতি। সেটা কি হয়?'

'তুমি কি ঠাট্টা করছ? সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করলাম। আমি খুব পরিষ্কার। গ্রাউন্ড রিয়েলিটি যা তাই তুলে ধরব রিপোর্টে।'

'তোমাকে আমি নতুন চিনি নাকি? মজা করলাম। তুমি ঘর ভাড়া নিয়েছ কেন? কতদিন লাগবে বলে মনে হয়? সদরের কোনো গেস্ট হাউসে থেকে যাতায়াত করা যেত না?'

'হয়তো যেত। তবে আমি সাইটের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি। ওখানে থাকলে চব্বিশ ঘণ্টা পাচ্ছি। ফলে সময় কম লাগবে।'

'খাওয়া-দাওয়া কীভাবে? নিজে তো কিছু পার না!'

'অজিত বাজার, রান্নার দায়িত্বে। দু-জনের রান্না ও সেরে নেবে। ঘর মোছা, বাসন মাজা একজন ঠিক করেছে অজিত। ফ্রেশ খাচ্ছি ম্যাম।'

'বেশ। ঘর তো দুটো তাই না? তার মানে ইচ্ছে করলে উইক এন্ড কাটিয়ে আসা যায়।'

'আরামসে। ভালোই লাগবে। গ্রামবাংলার ছবি সারাদিন চোখের সামনে। তবে তুমি যাওয়ার পাত্রী নও।'

'যদি সত্যি সত্যি যাই?'

'এই অধম কৃতার্থ হবে।'

তিন

কথা হল অনেক। সকাল-সন্ধেয় মাঠে, ঘাটে, ঘরে। হিসেবি নয়। কথা না বলে নিছক গল্প বা আড্ডা বলা বোধহয় সঙ্গত। ওই সম্পর্ক গড়ার প্রাথমিক শর্ত মেনেই হল। যেমনটা কন্যাকুমারী বলেছিল। আস্থা অর্জন করতেই প্রথম তিন দিন কেটে গেল। আশিস বুঝেছিল, সমাজে যে শ্রেণিতে ওর অবস্থান তা সন্দেহ ভাজনের তালিকায় উপরের দিকে। গ্রামের মানুষকে ঠকাতে ওত পেতে বসে থাকে। ফন্দি-ফিকির খোঁজে। প্রথম দিকে অজিত কথা বলতে শুরু করলে ওকে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া বা বহিরাগত আশিস বলতে গেলে স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে যাওয়া— এসবও ঘটল ওই শ্রেণিগত কারণে। অবশেষে কেতাবি ভাষায় যাকে ডায়লগ বলে তা শুরু হল। সেখানেও সাবধানতা। টাকা নাও, জমি দাও— এই ঢঙে নয়। বরং চাষবাস উৎপাদিত ফসল ও তার বিক্রি, যাপনের ওঠা-পড়া ইত্যাদি বিষয়ে কত গল্প। এসবই চলত কখনো আলে বসে, কখনো ঘরের দাওয়ার বসে চা-মুড়ি সহযোগে। এতে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। অচেনা মানুষ শহুরে পোশাকে মাঠে, গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কইছে, এমনটা যথেষ্ট সন্দেহজনক হবে বইকি। রাজনীতি ঢুকল। মানুষ এল, জিজ্ঞাসাবাদ চলল চিরাচরিত পথ ধরে। এই রাজনীতির ধরনটা আশিসের কাছে বড্ড চেনা। নজরানা দিয়ে যা খুশি করোগে। নচেৎ ঠেলা সামলাতে পারবে না। বাউন্ডারির বাইরে আছড়ে পড়তে হবে। এগুলো সামলাবার কায়দা আশিস জানে। সামলানোর মূলত দুটো উপায়। এক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার কথা বলা বা পারলে মিটিয়ে দেওয়া, আর না হয় স্পষ্ট বলে দেওয়া অমুকবাবু সব জানেন। আশিস এক্ষেত্রে বলেছিল, যে জমি কিনতে আসেনি। জমি পাওয়া যাবে কিনা তার খোঁজে এসেছে। যিনি কিনবেন, ওনার সঙ্গে কথা বলা ভালো।

হাইওয়ের ধার জুড়ে যেকোনো জমি শিল্প গঠনের পক্ষে উপযুক্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প স্থাপনের পক্ষে উপযোগী। কাছাকাছি জলের উৎস বলতে ছোটো-বড়ো পুকুর। কাছে-পিঠে নদী নেই। কিন্তু দশ দিনের নিবিড় কথোপকথনে যেটা

উঠে এল তা হচ্ছে, জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে চাষে যুক্ত মানুষজন জমি হাতছাড়া করতে নারাজ। চাষ ভিন্ন অন্য পেশার কর্মকুশলতা তাদের জানা নেই। বংশপরম্পরা যে পেশায় আছে, তাকে ছেড়ে অন্য কোনো অচেনা পেশায় যুক্ত হলে মুখে অন্ন জোটানো মুশকিল হবে। এমন অনিশ্চিতের উদ্দেশে পা ফলতে একেবারেই রাজি নয়। চোখের জল ফেলে এমনটাও বলে ফেলল যে রাজনীতির মদতে জমি মাফিয়া ভয় দেখিয়ে জবরদস্তি জমি নিয়ে নেবে। ভাগচাষির ক্ষমতা আর কতটুকু যে প্রতিরোধ করবে?

অনন্ত চুপিচুপি আশিসকে বলল, 'স্যর মুখের কথায় জমি মিলবে না। ঘিয়ের মতো আঙুল বেঁকালে জমি হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আপনি চাইলে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন।'

আশিস এমন প্রস্তাব শুনে বেশ অবাক হল। অনন্ত এই গ্রামে থাকে। ও যে ঠিক কী করে তা জানে না। তবে গ্রামে ওর মান্যতা আছে। রাজনীতি বা অন্য কিছুর সুবাদে কিনা তাও জানে না। এমনও হতে পারে ও জমি মাফিয়াদের সঙ্গে যুক্ত। নয়তো এমন প্রস্তাব কী করে দিচ্ছে? যেখানে জমি চলে গেলে গ্রামের মানুষ বিপদে পড়বে জেনেও অনন্ত নির্বিকার ভাবে বলছে!

মনের ভিতরের ভাব বুঝতে না দিয়ে আশিস জিজ্ঞাসা করল, 'কাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বলছ?'

'স্যর যারা জমি কিনতে সাহায্য করবে। আপনাদের টাকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে হবে না। জমি পেয়ে যাবেন।'

'আচ্ছা অনন্ত তুমি তো এই গ্রামের লোক। তোমার জমি নেই?'

'ছিল স্যর। এখন নেই। বেচে দিয়েছি। স্যর বলছি কী, আপনি একটা নির্দিষ্ট কাজে এসেছেন। সেটা কীভাবে সফল হবে, তার হদিশ দিলাম। নিবেন কি নিবেন না, সেটা আপনার ব্যাপার। আমি স্যর সাহায্য করতে চাই।'

আশিস অনন্তকে বললই না যে ওর কোম্পানি ওকে এখানে জমি কিনে কারখানা গড়া যাবে কিনা এই খবরটুকু সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছে। এর বেশি কিছু নয়। কীভাবে কোন কায়দায় জমি জোগাড় হবে তা জানা বা দেখার কথা যিনি কারখানা বানাবেন তাঁর। এটাও বলল না যে সরকার জাতীয় স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ করে সম্পদ সৃষ্টিতে বা মাটির নীচে জমা সম্পদ উত্তোলনের প্রয়োজনে। ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পদ সৃষ্টিতে সরকারের সদর্থক ভূমিকা কতটা আইনি মোতাবেক আছে তা আশিস জানে না। শুরুতে যেসব প্রশ্নাবলি নিয়ে আশিস মাঠে নেমেছিল তার অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দরকার হয়নি। জমি বেচলে তখন উত্তর খুঁজতে হত। যে অর্থে কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কোম্পানি চাইলে সেইসব প্রসঙ্গ রিপোর্টে স্থান পাবে। তবে অনন্তর প্রস্তাব কখনোই থাকবে না।

'স্যর কী এত ভাবছেন? জমি লিতে এসেছেন। জমি লিয়ে চলে যাবেন।'

'অনন্ত তোমার কথা সবটা শুনলাম। আমি তো শেষ কথা বলার মালিক নই। যারা কিনবেন তারাই কথা নিশ্চয়ই বলে নেবেন।'

'স্যর আপনি কি আজই কইলকাতা চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, সে রকম ইচ্ছে আছে। যা জানার তা যখন হয়ে গেছে আর থেকে কী করব? তোমার ও অজিতের যা টাকা পাওয়ার কথা তা দিয়ে দেব।'

'স্যর আবার কি ইদিকে আসা হবে? আসলে ফোন করবেন। দেখা করে লিব।'

'নিশ্চয়। আসলে দেখা হবে।'

অজিতের অনুরোধে আশিস ঠিক করল একবার ওদের গ্রাম দেখতে যাবে। এমন সুযোগ আগে কখনো আসেনি। ভবিষ্যতে আসবে কিনা ঠিক নেই। ওদের গ্রাম, ওদের জীবন-যাপন চাক্ষুস না করলে কিছু একটা বাকি থেকে যাবে। রিপোর্ট তৈরি করতে এই দেখাটাও জরুরি। অজিত একবার বলেছিল, ওদের গ্রাম থেকে বহু লোক এখানে খেতমজুরের কাজ করতে আসে। জমির চরিত্র পালটে গেলে ওরাও কর্মহীন। পরিসংখ্যান তৈরিতে কাজে লাগবে।

'বাবু একটা কথা শুধাব?'

'হ্যাঁ বলো না।'

'আপনাকে নেশা করতে দেখি নাই। ইখানের ঘরে তৈরি মহুয়া লিবেন? একটু দিবে?'

বিষয়টা এমন নয় যে আশিস কখনো মদ্যপান করেনি। উৎসব অনুষ্ঠানে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে চেখেছি। ভালো লাগেনি। তবে মহুয়া, হাঁড়িয়া জিবে ঠেকানোর সুযোগ হয়নি। একটা ভয়ও কাজ করে। দেশি মদ বিষাক্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনার নজির আছে। তবে অজিত যখন বলছে একটু পান করে দেখাই যেতে পারে। মহুয়ার গন্ধটা তীব্র, কেমন গা গুলিয়ে ওঠে।

আলো মরে আসা বিকেলে অজিতের সঙ্গে আশিস মাঠে এসে বসে। গ্রামের ধার ঘেঁষে মাঠ। তারপর শালের জঙ্গল। আশিস কথা দিয়েছে আজকের রাতটা অজিতের ঘরে কাটাবে। এই ডাঙা জমিতে পরবের অনুষ্ঠান হয়। সাঁঝের বেলায় মাঠে লোকজন বিশেষ নেই। অজিতের জিম্মায় রয়েছে কাঁচা ছোলা, কাঁচা লঙ্কা, মহুয়ার বোতল ও দুটো মাটির ভাঁড়।

ফুরফুরে হাওয়া বইছে। শালের জঙ্গল থেকে পাতা নড়ার সরসর ধ্বনি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কাজ করছে। ভাঁড়ে ঢালা মহুয়ায় চুমুক দিল আশিস। গন্ধটা সত্যিই বিদঘুটে। গলায় উষ্ণ তরল ধাক্কাও মারে সজোরে। সেই অভিঘাতে চোখে ঝিম লাগে।

কথা শুরু হতেই বয়ে চলে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সঙ্গত দেয় জঙ্গল থেকে ধেয়ে আসা মর্মর ধ্বনি। একেই বলে হয়তো মৌতাত। অবিশ্রান্ত কথোপকথন। কখনো

প্রশ্নকর্তা আশিস কখনো অজিত। যাপনের ঠিকুজি কোষ্ঠী অজিত অবলীলায় বের করে আনল। আশিসের কানে ঢুকছে অজিতের ছেঁড়া-ফাটা রূপকথার গল্প, আর নাকে ঢুকে স্নায়ুতে মিশছে ঘাস মাটির গন্ধ, মহুলের গন্ধ। আশিস ভিজে চলেছে বর্ণহীন সমাজ অচ্ছুতের ঘাম রক্ত মেশানো কান্নায়, 'বাবু চিরটাকাল পায়ের তলায় পড়ে থাকব। উঠতে গেলে ঝাপড় দিবে।'

বংশানুক্রমে সমাজের ঝরে পড়া ঘৃণা, নিপীড়নকে বাধ্যতামূলক আত্মীয় ভেবে অশ্রুজল মিশিয়ে বুকে ধারণ করে। ক্রোধ, ঘৃণা, লালসা অবিরত বর্ষণ হয়। কাজ বলতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মজদুরি। ঠিকাদার কাজ দেয়, টাকা দেয়, বিনিময়ে লুটে নেয় শ্রম, ইজ্জত। পরানটায় জ্বলন ধরলেও ক্ষুধা নিয়ে ঘরে বসে থাকা চলে না। ঠিকাদারের কাজ থেকে মাঠে চাষের কাজে ইজ্জত খোয়ানোর ভয় মেয়েদের থাকে না।

'বাবু ফসলের মাঠে কারখানা হলে গাঁয়ের মানুষগুলানের কাম থাকবে না। বেবাক মরে যাবে ভুখায়। গরমেন্ট কুচুটি করবে না। বাবু, কারখানা না হওয়ার লিখা যেন হয়।'

আশিস এবারে নড়ে উঠল। শাব্দিক ঝংকারে নেশা চটকে গেল। অজিত ভরসা করে কাতর আবেদন করছে যেন আশিস অন্যরকম কিছু লিখলেই কারখানা হবে না। সহজ সরল অজিত জানেই না ওরা কতটা ভয়ংকর, কতটা আগ্রাসী। বিগত দশদিন আশিস অনেক কিছু দেখেছে, জেনেছে। মন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়ার মতো কাহিনি শুনেছে। আজও আর একবার শুনল।

আবার সেই ফালাফালা করা কথা, 'বাবু মোদের কথা কেহ শুনবেক লাই। মোরা নিচু জাত। মোরা মানুষ নই। আপনি মোর কথা ফেলে দিবেন লাই।'

আশিস নিরুত্তর। বড়ো অসহায় বোধ করল। আশিস বুঝতে পারছে। ওই ভরা ফসলের সবুজ প্রান্তর, ছড়িয়ে থাকা শাল জঙ্গল— সবই ধ্বংস হবে বাণিজ্যিক সভ্যতার বিনির্মাণে। সবুজের গন্ধ, ধানের গন্ধ, উবে ধেয়ে আসবে উন্নয়নের দম্ভ, সঙ্গে কটু গন্ধ ও কর্কশ শব্দ। গাঁয়ে বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা মায়ময় কৌলিন্য মুছে শহুরে ছত্রাকে ভরে যাবে। নবান্নের গান কেউ গাইবে না। ধান নেই তো গান কোথায়?

চার

'আবার চলে এলে যে?'

'কাজ শেষ তাই চলে এলাম।'

'রিপোর্ট লেখা হয়ে গেছে?'

'না হয়নি। নোট্স নেওয়া হয়েছে। অফিসে কথা বলে রিপোর্ট লিখব।'

'কী দাঁড়াল তোমার গ্রাউন্ড জিরো সার্ভে?'

'যা ভেবে কাজ শুরু করেছিলাম অনেকটা তাই। জমির মালিক, অথচ চাষি নয়, তারা জমি বেচতে খুবই আগ্রহী, আর ভাগচাষি জমি চাষের অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। সাধারণত জমিতে চাষে যুক্ত খেতমজুর, ক্ষুদ্র প্রান্তিক বা মাঝারি চাষি, ধনী চাষি। বাংলায় ধনী চাষি নেই। জমির মালিক ও চাষি জমি বেচবে না। প্রত্যেকের এক কথা, জমি বেচার টাকা দিয়ে বেশি দিন চলবে না। টাকা ফুরালে অন্ন জুটবে না। খেতমজুরদের হিসেব জানি না। শুধু অজিতের গ্রামে এরকম খেতমজুরের সংখ্যা কম নয়। ওরাও নাকি বছরের পর বছর ধরে ঠাকুরদা-বাপ-ছেলে, এই সমীকরণে চলে। জমি নেই তো ওদেরও কাজ নেই।

'তোমার রিপোর্টে কি এইসব কথা থাকবে? এগুলি তো জমি দখলের পরিপন্থী।'

'রিপোর্ট ফাইনাল করার আগে অফিসে কথা বলব। তবে অজিত বার বার বলেছে এমন রিপোর্ট লিখতে হবে যাতে কারখানা না হয়।'

'তুমি কি সরাসরি তা লিখতে পার? মধ্যবিত্ত মানসিকতা সেটা লিখতে সাহস যোগাবে?'

'হয়তো না। এমনভাবে লিখতে হবে যাতে ভরা ফসলের জমিতে কারখানা গড়ার উৎসাহ হারায়।'

'তোমার কি মনে হয় সেই রিপোর্ট তোমার অফিস মেনে নেবে? যারা তোমাদের কোম্পানিকে রিপোর্ট জানাতে টাকা দেবে, তারা এরকম নেগেটিভ রিপোর্ট পছন্দ করবে?'

'জানি পছন্দ করবে না। যা যা বাধাবিপত্তি আসবে, যেগুলো থেকে বেরোবার সুলুকসন্ধান পরিষ্কার ভাবে জানাতে হবে।'

'তা হলে কি করবে? রিপোর্টে বিপ্লবের গন্ধ কি থাকবে?'

'এমন লাঠি খুঁজতে হবে যা দিয়ে সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না।'

'তুমি তো বললে দালালরাজ ময়দানে ঝাঁপাতে তৈরি। মুখ থেকে কথা ফসকালেই লুফে নেবে। এই জমিতে হাঙরদের উল্লেখ কি থাকবে?'

'না থাকার, প্রশ্নই নেই। যে প্রশ্নমালা অফিস তৈরি করে হাতে ধরিয়েছিল তাতে বলপূর্বক জমি দখলের রূপরেখা বানাতে বলা হয়নি। সাইট নির্বাচন সঠিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকার জন্য। তার উল্লেখ থাকবে। এগুলোর গুরুত্ব কম নয়।'

'কবে যাচ্ছ অফিস?'

'কাল। তবে একটা কথা শুনে রাখো আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। শত চাপেও অজিতদের পেটে লাথি মারতে পারব না। ওদের গ্রামে গিয়ে দেখেছি। ওদের যাপনের কষ্ট বর্ণনাতীত। সমাজে এদের মান নেই, পেটে ভাতও নেই।'

'সত্যিই চাষের জমির চরিত্র বদল হলে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় খেতমজুর ও ভাগ চাষিদের। চাষির আত্মহত্যা তাই দিন দিন বেড়ে চলেছে। ঋণের দায়ে প্রতি বারো মিনিটে একজন। খেতে না পেয়ে অসুখে ভুগে বা পরিজনদের খাদ্যাভাবে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী লেগেই আছে।'

'জানো অজিতদের গ্রামে ঘরে ঘরে অভাবের চিহ্ন স্পষ্ট। এর সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে সেঁটে আছে অপরাধীর তকমা। ওরা হেসে বলে, ভাতের বদলে এটাই সমাজের দেওয়া অলংকার।'

'বলে কি আর সাধে? হৃদয় খুঁড়ে অশ্রুজল প্রকাশ্যে ঝরে না। ঝরে আড়ালে, সংগোপনে।'

'জাতপাতের সমস্যা এই বাংলায় যে আছে তা আগে জানতাম না। আসলে মেলামেশার সুযোগ না হলে জানা যায় না।'

'যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত জাতপাত প্রথা সমাজে দিব্যি চলে আসছে। এ একধরনের স্থিতিশীলতা। এই কাঠামো ভাঙা সহজ নয়। এর শিকড় আষ্টেপৃষ্টে মনের গভীরে জড়িয়ে। হাথরসের মতো ঘটনা এখানে একেবারে ঘটেনি তা তো নয়। নিপীড়ন পৈশাচিক মাত্রায় পৌঁছোলে প্রতিবাদ হয়, মিছিল হয়। কিন্তু মানুষের তৈরি এই কুৎসিত ঘৃণ্য নিষ্ঠুর কাঠামোটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ধারাবাহিক আন্দোলন কোথায়? সংবিধানে শুধু লেখা আছে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ।'

আশিস দেখেছে খেতমজুরের কাজ করা অজিত জমি কেনার বিষয়ে কথা বলতে গেলে মাঝারি চাষি হাসে। এখানেও ওই শ্রেণি সচেতনতা কাজ করে। ফলে অজিতদের এতটা দর দিতে রাজি নয়। জাতপাতের কাঠামো না থাকলে অজিতরা জাতে উঠে আসবে। এটা ওদের ওপরের অবস্থানে থাকা কেউ মেনে নেবে না। অনন্তকেও দেখেছে অজিতকে নিয়ে কৌতুক করে মজা পেতে।

'কী এত ভাবছ?'

কন্যাকুমারীর প্রশ্নে আশিস চটকা ভেঙে ভাবা কথাগুলি বলল।

'ঠিকই। অপমান, অত্যাচার, মজা লোটা কৌতুক করা— এসবগুলো বর্ণ সমাজের অধিকার। যাকে রমণ করছে সেই কন্যা কাঁদছে আর যে কর্মটি করছে সে হা হা করে হাসছে! একটা সিস্টেম দীর্ঘদিন ধরে কায়েম থাকলে অন্তর্নিহিত জটিল সমীকরণগুলো সরল করা সহজ নয়।'

'তোমার হয়তো প্রোজেক্টের কাজে ঘুরে বেড়িয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার এই প্রথম। এত রূঢ় বাস্তব চোখে দেখার অভিজ্ঞতা পরবর্তী দীর্ঘসময় জুড়ে পীড়া দিয়ে চলে। এখন বুঝি, কেন আমরা এসব এড়িয়ে অলীক বিনোদনে মত্ত থাকি।'

'এবারে শোনো, গান্ধীজি বলেছেন, ভারতীয়রা এই প্রথা মেনে নিয়েছে। বিরোধিতা সত্ত্বেও বজায় থাকবে। উচিত, ন্যায়নীতি বিরোধী দিকগুলি বর্জন করা। প্রশ্ন হচ্ছে, নীতি বহির্ভূত কোনো প্রথায় কি আর ন্যায় থাকে?'

'তা হলে যেমন আছে তেমনই থাকবে? অন্যরকম ভাবাটাই অলীক স্বপ্ন?'

'যতই আমরা আড্ডায় তর্ক করি, বিপ্লবী কথার তুফান ছোটাই, দিনের শেষে— কাস্ট ম্যাটারস।'